

শিক্ষায় অগ্রগতি : বিজয়ের ঋদ্ধ গোলাপ

অধ্যক্ষ এসএম খায়রুল বাসার

বিশ্বে কমসংখ্যক দেশই আছে যারা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান জাতি যারা দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছি। তাই হয়তো বা যুদ্ধ করে পাওয়া গর্বের-অহংকারের স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছেও অনেক বেশি। স্বাধীনতার ৪৫ বছরে বাংলাদেশ আজ নিন্দুরের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' তো নয়-ই, বরং বাংলাদেশকে 'ইমাজিং টাইগার' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক দাতা ও গবেষণা সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞরা। প্রাপ্তির এই বিস্ময়কর ভাণ্ডারে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জন অসামান্য।

২০০ বছর ব্রিটিশ শাসন শেষে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর মানুষ ভেবেছিল সুসময় আসবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি! পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনাকাল থেকে স্বাধীনতাকালীন সময় পর্যন্ত ২৪ বছর ধরে সময় ও প্রেক্ষাপট পাল্টালেও শাসকদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হওয়ায় পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণ শিক্ষা, অর্থনীতি, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়।

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক বৈষম্যের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সময়কালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৯৯৫টি বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে ৪৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হ্রাস পেয়েছিল।

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিক মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অনুপ্রেরণায় এই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক দূর। ৪৫ বছরে শিক্ষা খাতে অন্ধকার কেটে এসেছে আলো। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ১৬.৮ শতাংশের সাক্ষরতার হার এখন পৌঁছেছে ৭১ শতাংশে (আন্তর্জাতিক প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষরতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তীর বাণী অনুযায়ী)। যেখানে পাকিস্তানের সাক্ষরতার হার ৫৫ শতাংশ। নারী শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যেখানে ৭৪% হয়েছে, পাকিস্তানের নারী শিক্ষার হার সেখানে ৬১%। শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে অগ্রগামী। পাকিস্তানি আমলের (১৯৪৭-১৯৭১) ২৪ বছরের সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫টি

বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে; সেখানে স্বাধীনতার পর এই পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে ৩৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আর পাকিস্তানি আমলে কোন বেসরকারি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় না; সেখানে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ৮৯টি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ২টি। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অনার্স পড়ার ব্যবস্থা ছিল হাতেগোনা সাত থেকে আটটি কলেজে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স পাঠদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫০০-এর বেশি বলে ধারণা করা হয়। ১৯৭০ সালে

বিস্তৃত হয়েছে শিক্ষার সুযোগ, বেড়েছে অংশগ্রহণ, অব্যাহত হয়েছে উচ্চশিক্ষার দুয়ার। আর পরীক্ষার ফলাফলেও এসেছে অভাবনীয় সাফল্য।

তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি। বিশ্বব্যাংকের এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ অবিচলভাবে শিক্ষায় অভিজ্ঞতায় বাড়িয়েছে, যার ফলে প্রাথমিক স্কুলে মোট ভর্তির হার ৯১ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০০ শতাংশের উন্নিত হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তির হার ৭২ থেকে ৬২ শতাংশ হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তির

এটি পাঠ্যপুস্তক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট সাড়ে ২৬ কোটি ২ লাখ ২১ হাজার ৮৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মোট ১৮৯ কোটি ২২ লাখ ২৯ হাজার ৮০৭টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সম্পন্ন হবে। সরকারিভাবে এত বই ছাপিয়ে বাধাই করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সবগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিনে বিতরণের ইতিহাস বিশ্বের কোথাও নেই। এমন উৎসবও পৃথিবীর কোথাও নেই।

পরিকল্পিতভাবে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। স্কুলে ১ জানুয়ারি ও কলেজে ১ জুলাই ক্লাস শুরু, ১ নভেম্বর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা ও ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু এবং ৬০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে অভাবনীয়ভাবে। শুধু ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, ৩১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু, কারিগরি শিক্ষা টেলে সাজানোর উদ্যোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন শিক্ষা ক্ষেত্রের ইতিবাচক দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে। শিক্ষা যেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ের ঋদ্ধ গোলাপ হিসেবে আজ প্রস্ফুটিত।

এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর আধুনিক জীবন-দর্শনের কারণে। তিনি বুঝছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের টেকসই সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ সবচেয়ে ভালো বিনিয়োগ। তাই তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন এবং সব শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকারকে সাংবিধানিক অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রয়োজন সোনার মানুষ। আর সোনার মানুষ গড়তে হলে মানসম্মত শিক্ষার হার শতভাগ করতেই হবে। স্বাধীনতার ৪৫ বছরে তাই জাতির জনকের স্বপ্নপূরণে শিক্ষা খাত জাতীয়করণ এবং এই খাতে পর্যায়ক্রমে বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হোক এবারের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার।

[লেখক : সাংবাদিক ও কলাম লেখক]
kbasher74@gmail.com



বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল সাত হাজার ৫২৩টি। এই সংখ্যা ২০০৮ সালে হয়েছে ৩১ হাজার ৪০১টি। আর বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় (১১ ধরন), মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কওমি মাদ্রাসা, কিভারগার্টেন, ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা তো অবাক করার মতো।

দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে ৪ কোটি ৪৪ লাখ শিক্ষার্থী, যা বিশ্বের বহু দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এছাড়া কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাবি অনুযায়ী দেশে এ ধরনের মাদ্রাসা আছে ১৫ হাজার ২৫০টি; এত শিক্ষার্থী আছে ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ জন। সবমিলে

হার ৩৩ থেকে ৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার ৭ থেকে ১০ শতাংশ হয়েছে। সংস্থাটির মতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাদেশ নারী-পুরুষ সমতাও অর্জন করেছে। মাধ্যমিক স্তরে বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ যেখানে ৪৯ শতাংশ সেখানে বাংলাদেশে দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৫০ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ৫৫ শতাংশই ছাত্রী। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরীভূত হয়েছে জেন্ডার বৈষম্য।

স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এলেও বিনামূল্যের পাঠ্যবই প্রদান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সার্বিক চিত্রকেই পাল্টে দিয়েছে। শুধু বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদানই নয়, বর্তমানে